Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 35–41
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বাংলা ছোটোগল্পে বিচিত্র পেশা : প্রসঙ্গ ভগীরথ মিশ্রের 'সুবচনী'

অর্জুন মাঝি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ শালবনি, পশ্চিম মেদিনীপুর
ই-মেইল : majhiarjun79@gmail.com

Keyword
অন্ত্যজ, ভগীরথ মিশ্র, সুবচনী, মেজো খুড়ি, পুষ্করা বাউরি, মিহির দত্ত, গলা ফাটানো, ক্যানসার।

Abstract
মানুষ নিজেকে ও নিজের পরিবারের সদস্যদের জীবন অতিবাহিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে যা করে থাকে সেটাই হল বৃত্তি বা পেশা। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত রচিত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দরিদ্র অন্ত্যজ মানুষদের বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা গেছে। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেশাগত দিক থেকেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। কথাসাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার সেংগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত সুবোধ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, রমাপদ চৌধুরী, ভগীরথ মিশ্র, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘড়াই প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের হাতে অঙ্কিত অন্ত্যজ মানুষদের বৃত্তিগত ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা গেল অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে যেমন পতিতা বৃত্তির মতো হীন জীবিকা, দুধ পান করিয়ে সংসার চালানো, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কেঁদে অর্থ উপার্জন, বাঁদর মেরে অর্থ উপার্জন বা কাক মেরে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে সংসার চালাতে দেখা যায়। এরকমই একটি গল্প ভগীরথ মিশ্রের 'সুবচনী' যার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পেয়েছে অন্যের হয়ে গালিগালাজ করে অর্থ উপার্জনের মতো একটি বিচিত্র পেশা। জীবনের শেষ পর্যায়ে উপস্থিত হয়ে সুবচনী বাউরির গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হওয়ার মতো মর্মান্তিক পরিণতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে গল্পটিতে। একই সঙ্গে তাতে অবিভক্ত মেদিনীপুরের একটা প্রত্যন্ত এলাকায় গল্পকারের জন্মগ্রহণ এবং সরকারি আধিকারিক হিসাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে লব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে।

Discussion
বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে অন্ত্যজ মানুষদের বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা গেছে। আদি যুগে রচিত 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল' ইত্যাদি কাব্যের অন্ত্যজ মানুষেরা একাধিক নিম্নমানের পেশার সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজেদের সংসার চালিয়ে গেছে। আধুনিক যুগে উপস্থিত হয়ে মানুষের জীবনযাপনের ধরন অনেকটা পাল্টে যাওয়ায় জীবিকা ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সঙ্গে ছোটোগল্পের ধারাতেও সেই সকল পেশা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র,

তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার সেংগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের একাধিক গল্পে নিম্নশ্রেণির মানুষদের বিচিত্র জীবিকার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ে সুবোধ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, রমাপদ চৌধুরী, ভগীরথ মিশ্র, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘড়াই প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের হাতে অঙ্কিত অন্ত্যজ মানুষদের বৃত্তিগত ক্ষেত্রে বৈচিত্র দেখা গেল অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে যেমন পতিতা বৃত্তির মতো হীন জীবিকা (সুবোধ ঘোষের ‘পরশুরামের কুঠার’), দুধ পান করিয়ে সংসার চালানো (মহাশ্বেতা দেবীর ‘স্তনদায়িনী’, ‘যশোমতী’), বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কেঁদে অর্থ উপার্জন (মহাশ্বেতা দেবীর ‘রুদালী’), অন্যের হয়ে গালিগালাজ করে অর্থ উপার্জন (ভগীরথ মিশ্রের ‘সুবচনী’), কাক মেরে অর্থ উপার্জন (অনিল ঘড়াই’র ‘কাকমারা’) বা বাঁদর মেরে অর্থ উপার্জন (রমাপদ চৌধুরীর ‘মানুষ অমানুষের গল্প’) করে সংসার চালাতে দেখা যায়। যেহেতু, আমাদের আলোচ্য গবেষণাপত্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু ভগীরথ মিশ্রের ‘সুবচনী’ গল্প, তাই অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের গল্পগুলির বিশদ পরিচয়ে অবতীর্ণ হওয়াটা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। তবে, মূল আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ভগীরথ মিশ্রের ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে কিছু কথা বলা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

কথাসাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র ১৯৪৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি ব্লকের সাঁতরাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাধাশ্যাম মিশ্র এবং মাতা ছিলেন চারুলতা দেবী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পরাশুনা সমাপ্ত করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্যে কলকাতায় পদার্পণ করেন। আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পরে ভূগোল বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ হয়েও তিনি প্রতিকূলতার কাছে কখনো মাথা নত করেননি। এম এ পাশ করার পর নিজের যোগ্যতায় ১৯৭৪ সালে ব্যারাকপুরের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরিতে যোগদান করেন। সেই বছরই তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সফল হয়ে প্রথমে বি ডি ও, তারপর কালেক্টর এবং শেষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করতে সক্ষম হন। পেশাগত দিক থেকে ছিলেন একজন সরকারি কর্মী। সেই সুবাদে প্রত্যন্ত স্থানে গমন ও সেই সকল স্থানের আদিবাসী-হরিজন মানুষদের কাছাকাছি পৌঁছানোর সৌভাগ্য লাভ করেন তিনি। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাস ও ছোটোগল্পের কেন্দ্রবিন্দু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবন ও সংস্কৃতি।

তবে, তাঁর সাহিত্য রচনার সূত্রপাত স্কুল-কলেজর ছাত্রজীবন থেকেই। ১৯৬৬ সালে আশুতোষ কলেজে একটি গল্প লেখার প্রতিযোগিয়তায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। এরপর তিনি ‘নবকল্লোল’, ‘মধুপর্ণী’, ‘বর্তিকা’, ‘অনুষ্টুপ’ ইত্যাদি পত্রিকায় লেখালেখি চালিয়ে যান এবং একজন জনপ্রিয় লেখক হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হন। তাঁর লেখা প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। এর কয়েক বছর পর ১৯৯০ সালে প্রমা পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘অন্তর্গত নীলস্রোত’। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস **‘তস্কর’** (১৯৯২), **‘আড়কাঠি’** (১৯৯৩), **‘জানগুরু’** (১৯৯৫), **‘মৃগয়া’** (১৯৯৬-২০০০) ইত্যাদি। সেগুলিতে তিনি অন্ত্যজ দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবিকা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দান করেছেন।

কথাসাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র “সত্তর দশকের সেই শিল্পী, যিনি গল্প-উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের সাহিত্যে এনেছেন শাশ্বত সত্যকে এবং জীবনবোধের গভীরতাকে। তিনি মনে করেন, এই দৃষ্টিভঙ্গির উৎসে ছিল সত্তরের দশকের মার্কসীয় জীবন দর্শন ও বামপন্থী সংস্কৃতি।”[১] তাঁর কথাসাহিত্যে বাল্য ও কৈশোরকালের লব্ধ বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন স্থান ভ্রমণসূত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা, সরকারি আধিকারিক হিসাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গমন ও আদিবাসী জনজীবনের সংস্পর্শজাত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। তাঁর **‘তস্কর’**(১৯৯২) উপন্যাসে আদিবাসী যুবক গোক্ষুর ভক্তা নিজের চৌর্যবৃত্তি পরিহার করে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করে এবং **‘আড়কাঠি’**(১৯৯৩) উপন্যাসে অধ্যাপক গবেষক রাজীবের লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের মধ্য দিয়ে বাঁকুড়া জেলার গজাশিমূল গ্রামের আদিবাসী জনজীবনের মধ্যে প্রচলিত আদিবাসী সংস্কৃতিকে অসাধারণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর দশ বছর ধরে গবেষণার মধ্য দিয়ে পাঁচ খণ্ডে রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস **‘মৃগয়া’** (১৯৯৬-২০০০)। উপন্যাসটির মূল কেন্দ্রবিন্দু অন্ত্যজ মানুষদের ওপর সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-পীড়ন।

উপন্যাসের মতো তাঁর একাধিক ছোটোগল্পেও অন্ত্যজ মানুষদের বিচিত্র জীবিকা এবং জীবিকা পরিবর্তনের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর **'ইন্দরযাগ'** (১৯৮৫) গল্পে শিক্ষাদীক্ষার উন্নতিতে ওঝা-গুণিনদের জীবিকা সংকট তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, তাঁর **'দৃষ্টি'** (১৯৯৮) গল্পে পঞ্চায়েতের নির্দেশে জনপ্রিয় ঝড়েশ্বর লুহারকে ওঝাবৃত্তি পরিহার করে বিকল্প জীবিকার সন্ধানে বের হতে দেখা যায়। একইভাবে, একজন অন্ত্যজ মহিলার এক বিচিত্র জীবিকার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তাঁর **'সুবচনী'** (১৯৯২) গল্পে। আলোচ্য গবেষণাপত্রে আমরাকে সেই বিচিত্র জীবিকাটির অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হতে হবে।

কথাসাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র নিজে একটি প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ হওয়ার সুবাদে নিম্নশ্রেণির ও নিম্নবৃত্তির মানুষদের জীবনাচরণ খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পান। সরকারি আধিকারিক হিসাবে কাজ করার ফলে হাড়ি, বাউরি, ডোম, বাগদি, শবর, কুর্মি, সাঁওতাল, মুন্ডা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাকে আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন। অনেকসময় তাদের সমস্যা মেটানোর জন্যেও এগিয়ে গেছেন। সেই সকল মানুষ নিজেদের পেট চালানোর জন্যে নানা প্রকার নিম্নমানের বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। নিম্নমানের সঙ্গে সঙ্গে অনেকসময় সেগুলি হয়ে ওঠে বিচিত্র প্রকৃতির। এরকমই এক বিচিত্র জীবিকা হল গালিগালাজ করে অর্থ উপার্জন। দুই পক্ষের ঝামেলায় অর্থের বিনিময়ে একপক্ষের হয়ে গালিগালাজ করে বিপক্ষকে পরাস্ত করার পেশায় সুদক্ষ **'সুবচনী'** গল্পের সুবচনী বাউরি।

গল্পকার আলোচ্য গল্পটিতে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একজন দরিদ্র অন্ত্যজ মহিলার জীবনের যন্ত্রণাময় কাহিনি পরিবেশন করেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুবচনী বাউরি পাড়ার স্বামী পরিত্যক্তা একজন ষাট বছরের বৃদ্ধা। প্রথম পরিচ্ছেদে গল্পকার পাঠকদের সামনে তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন -

> "বয়েস কম হল না বুড়ির। কমপক্ষে তিন-কুড়ি। মাথার চুল সব শনের মতো সাদা। মুখের চামড়া কোঁকড়ানো, চিমসে। শরীরের হরেক ডিজাইনের উল্কিগুলো ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে চামড়ার ভাঁজে। চোখদুটিও ঢুকে গেছে কোটরে। অনবরত গলা ফাটাবার পক্ষে বয়েসটা বেশিই। অন্য কেউ হলে হেদিয়ে পড়ত ঘড়িটাক বাদে। কিন্তু এ হল, সুবচনী বাউরি।"[২]

কুরুক্ষেত্রের মাঠে যুবতী মেয়েরাও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না এমনই গলার জোর। তাছাড়া তার ভাণ্ডারে গালিগালাজের উপযোগী শব্দের সংখ্যা অন্যদের থেকে অনেক বেশি। তবে, তার পসারের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রধান বাধা তার রুগ্ন শরীর। তার কোমর থেকে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেছে। হাঁটাহাঁটি করতেও পারে না। তাই, বিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্যে তাকে ভ্যানে করে নিয়ে যেতে হয়, আবার কাজ হয়ে যাওয়ার পর বাড়ি পৌঁছেও দিতে হয়। তার ঝুপড়ির পাশেই রয়েছে একটা দীঘি। গল্পকার সুবচনীর নিঃসঙ্গতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে লিখেছেন –

> "দীঘিটা বড়ই নিঃসঙ্গ। চিরকালই। ঠিক সুবচনীর মতন। সেই কারণেই বুঝি, এই দীঘির পাড়টিতে এসে বসলে মনের মধ্যে এক ধরনের একাত্মতা বোধ করে সুবচনী।"[৩]

দীর্ঘ চল্লিশটা বছর অন্যের হয়ে গলা ফাটাতে গিয়ে তার গলায় দেখা দিয়েছে এক ধরনের সুতীব্র যন্ত্রণা। মাঝে মধ্যে তাকে ঔষধ কিনতেও হচ্ছে। গলার যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক যন্ত্রণাও কম নয়। মনে দেখা দিয়েছে পাপ-পুণ্যবোধ। তাই সে মনে মনে ভাবে –

> "দুনিয়ার কত লোক কত কিছু করে পেট চালাচ্ছে, সুবচনী কেন ধরল অমন বেয়াড়া লাইন? মানুষকে বাখান দিয়ে পেটের ভাত জোগাড় করা, এ হেন বৃত্তি তাকে কে শেখাল!"[৪]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুবচনীর স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে একজন গ্রাম্য বালিকা থেকে গালিগালাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের মতো বিচিত্র পেশায় প্রবেশের বিচিত্র কাহিনি। বাল্যকাল থেকে সে বড় হয়ে উঠেছে বাউরি পাড়ার এমন এক পরিবেশে যেখানে কলহ ছিল একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ছাগলে গাছ খাওয়া বা গাছের ডাল ভাঙা বা কারও বাড়ির সামনে কোন বাচ্চা প্রস্রাব করা– এরকম সামান্য ব্যাপার নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে তুমুল লড়াই লেগেই থাকত। লড়াইয়ে যে পক্ষ যত বেশি অশ্লীল গালাগালি দিতে পারত, জয়ী হত তারাই। সেই সঙ্গে ছিল উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি। এরককম খিস্তি খেউড়ের লড়াইয়ে একসময় সুনাম অর্জন করেছিল সুবচনীর মেজো খুড়ী রাধী বাউরি এবং পুষ্করা বাউরির মা এলোকেশী বাউরি। প্রতিবেশীদের মধ্যে এরকম লড়াই শুরু হলেই তারা সুবিধামতো দুই পক্ষে যগদান করে নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিত। দীর্ঘ সময় ধরে গলা ফাটাবার কারণে তাদের গলা শুকিয়ে যেত। তাই, মাঝে মধ্যেই জল যোগান

দেওয়ার জন্যে ঘটিতে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত সুবচনী। ফলে, সেই অল্প বয়স থেকেই সে খিস্তি শুনে আসায় তার ভান্ডারেও বিভিন্ন প্রকার অশ্লীল শব্দ সঞ্চিত হয়ে আসছিল। মাঝে মধ্যে সে নিজেও মেজো খুড়ির হয়ে আসরে যোগদান করত। একসময় সে খিস্তিতে মেজো খুড়ি ও পুষ্করা বাউরিকেও অতিক্রম করে চলে যায়। কয়েকবছর পরে, সে একদিন মেজো খুড়ির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। অন্যান্যদের থেকে খিস্তিতে সে ছিল একটু আলাদা গোত্রের। সে ছড়া কেটে কেটে খিস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্যদের থেকে অনেক বেশি সুদক্ষ ছিল। এলোমেলো ছড়া থেকে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দযুক্ত ছড়া– কোনটাতেই সে পিছিয়ে থাকত না। গল্পকার তার সেই কৃতিত্বের এমন কিছু নমুনা তুলে ধরেছেন যা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। তার কণ্ঠে উচ্চারিত –

পয়ার ছন্দের খিস্তি –

"খালমুয়ী, ভাতারখাকী দিস নাই ক লাফ।
আমার বাপ ত ভালো মানুষ, (তুয়ার) বেধা বাপকে ডাক।।"[৫]

ত্রিপদী ছন্দের খিস্তি -

"ওরে ম্যাদা হাতি তুয়ার মূখে লাথি
মর তুই পুইড়্যে আগুনে।
অরে খালমুয়ী, মর মর তুই
খাক তুয়াকে শ্যাল শাগুনে।।"[৬]

চৌপদী ছন্দের খিস্তি –

"অরে মাইজো-কাকী
শুন রে ভাতারখাকী,
তুয়াকে আমার কুস্থানে রাখি
তুয়ার মুখে আমি জুমড়া-কাঠ জাঁকি।"[৭]

খিস্তি মারার এরূপ দক্ষতাই সুবচনীকে একদিন রাধী খুড়ির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করতে সাহায্য করে। তার কীর্তির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে ঘুঘিমুড়া গ্রামের নিতাই বাউরির সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে স্বামীকে সন্তান দানের অক্ষমতার কারণে স্বামীর হাতে প্রহৃত ও বিতাড়িত হয়ে পিতৃগৃহে বসবাস করতে বাধ্য হয়। একই সঙ্গে তার গালিগালাজে অশ্লীলতার সীমা লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে ভদ্র সমাজের কাছে হয়ে যায় অস্পৃশ্য। সকলেই তাকে পাশ কাটিয়ে চলার চেষ্টা করে –

"কাজেই পেট চলতে চায় না সুবচনীর। সে মাঠে ঘাটে গোবর কুড়োয়, ঘুঁটে দেয়, ব্যাচে। কিন্তু তাতে করে কিছু হয় না। প্রায় দিনই অনাহারে কাটে ওঁর; শরীরের চামড়া চিমসে হয়ে আসে; দু-চোখ গর্তে ঢুকে যায়।"[৮]

অর্থাৎ তার মুখের ভাষা তার জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে একধরনের সংকট তৈরি করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাই দেখা যায়, সুবচনী পেটের দায়ে বাধ্য হয়েছে মিহির দত্ত নামে একজন নেতার স্মরণাপন্ন হতে। তিনি সবে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বিরোধী দলে যোগদান করেছেন। নিম্ন সম্প্রদায়ের কাছে নিজের ফিল্ড বাড়ানোর জন্যে তিনি কয়েকজন মহিলা সহ সুবচনীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন বিষ্টুপুর ব্লক অফিসে। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্যে তারা বি.ডি.ও সাহেবকে আধ ঘণ্টা ধরে অশ্লীল ভাষায় খিস্তি মারতে থাকে। বি.ডি.ও সাহেব নিজের মান বাঁচানোর জন্যে প্রত্যেককে দু'কেজি করে আটা দিয়ে বিদায় দিতে চাইলে তারা চার কেজি করে চেয়ে বসে। সেই পরিমাণে আটা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা বোঝানোর চেষ্টা করতে গিয়ে অতবড় গণ্যমান্য মানুষটা প্রায় কেঁদে ফেলেন। প্রথম সাফল্যের দিন কয়েক পরে সুবচনী আবার মিহির দত্তের মাধ্যমে উপস্থিত হয় ব্লক অফিসে। এবারে সে সমেত প্রায় জনা পঞ্চাশ বাউরি মেয়ে। নানাপ্রকার খিস্তি মেরেও মাত্র এক কেজি করে আটা নিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

খিস্তি মেরে আরও কিছু আদায়ের আশায় সুবচনী আবার একদিন মিহির দত্তের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বি. ডি. ও. অফিসে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। কারণ, এর পূর্বের ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সে সুবচনীকে ছোটো ভাই পল্টু দত্তের হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেয়। প্রতিবেশী সন্তোষ দাসের ছেলেরা মাঝে মধ্যেই তাঁর ভাইয়ের পল্ট্রি ফার্ম থেকে ষাঁড়া-মুরগি চুরি করে খেয়ে ফেলে। তাই, তাদের বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে সুবচনীকে এমন বাখান দিতে হবে যাতে আগের দিনে হারিয়ে যাওয়া ষাঁড়া-মুরগিটা ফিরে পাওয়া যায়। সফল হলে সে পারিশ্রমিক পাবে দু'টাকা। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গালি দেওয়ার ক্ষেত্রে –

> "সুবচনীর হাতে-খড়ি হল ঐ দিনই। সে সন্তোষ দাসের বাড়ির দিকে মুখ করে পরিপাটি বসল মিহির দত্তর উঠোনে। তারপর শুরু হল প্যাঁচাল, 'কুন খালমুয়া আমার মুরগিটা লিলি রে? কুন ভাতারখাকী সিটা রাঁধলি রে? কুন মা-মেইগ্যারা খেলি রে? অরে, তুয়াদ্যার সক্কলের মুখে হাগি রে' এই মতে মুরগিটাকে বিষ্ঠা, গোমাংস, ইত্যাদি বলে প্রতিপন্ন করে ক্রমশ এগোতে থাকে সুবচনী।"[৯]

তার খিস্তির ফল মিলল হাতেনাতে। দুপুর নাগাদ চুরি যাওয়া মুরগিটাকে চরে বেড়াতে দেখা গেল মিহির দত্তের উঠোনে। প্রথম রোজগারের দু'টাকা পেয়ে সে মহানন্দে বাড়ি ফিরে। তার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে, কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যত উন্নত ও মার্জিত পথে এগিয়ে গেছে, গালিগালাজ তাদের কাছে ততই অসম্মানের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। যদিও -

> "তার সঙ্গে সঙ্গে সকল মানুষ এটাও জানে গালাগালির আলাদা এক ক্ষমতা আছে, মানুষকে শায়েস্তা করবার। তাই নিজে সে পথে না গিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির অন্বেষণ করেছে। আর এ ভাবনাতেই জীবিকা পেয়েছে সুবচনী।"[১০]

দিনের পর দিন এলাকায় তার সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারও বাড়ি থেকে মুরগি বা ছাগল বা হাঁস হারিয়ে গেলেই তারা তার কাছে ছুটে আসে। জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার পারিশ্রমিকও বাড়তে থাকে। কারণ, খিস্তি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাবুদের মান-সম্মান শুষে নিতে সে অত্যন্ত দক্ষ। আর –

> "সুবচনী ডাকতে বসলো, অথচ হারানো মালের হদিস মিলল না, এমনটা বড় একটা ঘটেনি জীবনে।"[১১]

এভাবে দিন চলতে চলতে একসময় সে ষাট বছরের বৃদ্ধা হয়ে ওঠে। কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরে গলা ফাটাতে গিয়ে একসময় তার গলায় যন্ত্রণা শুরু হয়। রাত্রিবেলা ঘুম আসে না সেই যন্ত্রণায়। কিন্তু, এই বয়সেও গলা না ফাটিয়ে তার কোন উপায় নেই। কারণ, এই সংসারে তাকে দেখার যে কেউ নেই সেটা সে জানে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা গেছে কুমুদ কাইতি নামে একজন ব্যক্তির হারানো খাসিছাগল পুনরুদ্ধারের জন্যে দালু কাইতির বিরুদ্ধে সুবচনীকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। গল্পকার অবশ্য তার পূর্ব প্রস্তুতির চিত্র গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনায় তুলে ধরেছেন। সেখানে কুমুদ কাইতি সুবচনীর সঙ্গে দর কষাকষিতে ব্যস্ত। সুবচনীর দাবি পনেরো টাকা আর তিনি দিতে চান দশ টাকা। শেষ পর্যন্ত বারো টাকায় রফা হয়। একটা জলপূর্ণ ঘটি পাশে নামিয়ে রাখার পর সে কুমুদের উঠোন থেকে দালু কাইতির বাড়ির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ওদের গতিবিধি যাচাই করে সে ডাকতে শুরু করে —

> "অরে গু খাউকার দল, তুয়াদ্যার কি বইলব বল,
> হাতি লয়, ঘোড়া লয়, চুইরলি এক ছাগল ;
> অরে ছাগল লয় সে গুড়ের ল্যাড়, খা—খা—খা—।
> অরে ছাগল লয় সে বকনা বাছুর, খা—খা—খা--।"[১২]

গালি দিতে দিতে একসময় প্রবল বেগে কাশতে শুরু করে সে। সেই কাশি কোনও ভাবে আর থামতে চায় না। কাশির সঙ্গে গলার যন্ত্রণা। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় সে।

গল্পকার একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে সুবচনীর জীবনের পরিণতি এবং মৃত্যুর পূর্বে তার অনুশোচনার চিত্র তুলে ধরেছেন। ডাক্তার দেখানোর পর তার গলায় ক্যানসার ধরা পড়ে। সেটা একপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি। একেবারে শেষ স্টেজে

ধরা পড়েছে। ফলে তার ডাক দেওয়ার জীবিকা চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। তবে শেষ বয়সেও তার চাহিদায় ভাটা পড়েনি। মাঝে মাঝে বাবুভায়ারা তার ঝুপড়ির বাইরে থেকে ডাক দেওয়ার বরাত দিতে এলেও সে তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। ফলে –

> "দিনরাত শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে সুবচনী। কত কিছু ঘটনা, দৃশ্য, কত স্মৃতি একসাথে ভিড় করে আসে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।"[১৩]

ছেলেবেলায় কথকের মুখ থেকে শোনা রামায়ণ ও রাধাকৃষ্ণলীলার গান স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। মনে মনে গেয়ে চলে–

> "দ্বার ছেইড়ে দে'রে দ্বারী
> ভিতরে আছেন শ্যামাসুন্দরী।"[১৪]

অন্যদের শোনাতে চাইলেও তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। এত সুন্দর পদ বাঁধার ক্ষমতা থাকলেও সারাজীবন সে কুকথায় বলে গেল। মনে মনে সেকথা ভেবে শিউরে ওঠে সে।

আলোচনার অন্তিম পর্যায়ে উপস্থিত হয়ে বলা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্যের একটি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প 'সুবচনী'। গ্রাম্য গালিগালাজকে কেন্দ্র করে যে এমন একটা ছোটোগল্প লেখা যায়, তা বোধ হয় প্রথম প্রমাণ করেন কথাসাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র। গ্রামাঞ্চলে সুবচনীর মতো চরিত্র হামেশাই নজরে পড়ে, যারা প্রতিবেশীদের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই অশ্লীল গালাগালিতে লিপ্ত হয়। কিন্তু, এটাকে পেশা হিসাবে দেখিয়ে গল্পে তা পরিবেশন করা একমাত্র ভগীরথ মিশ্রের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, পূর্বে কখনো এমন পেশার গল্প আমাদের নজরে আসেনি। অন্ত্যজ মানুষদের মুখের ভাষাকে অত্যন্ত সুদক্ষতার সঙ্গে কথাসাহিত্যে প্রয়োগ করে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

তথ্যসূত্র :

১. ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ, ১৯৫০-২০০০), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১১৩৬
২. ভগীরথ মিশ্র, শ্রেষ্ঠ গল্প দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৩৩
৩. তদেব, পৃ. ১৩২
৪. তদেব, পৃ. ১৩৪
৫. তদেব, পৃ. ১৩৭
৬. তদেব, পৃ. ১৩৭
৭. তদেব, পৃ. ১৩৮
৮. তদেব, পৃ. ১৩৮
৯. তদেব, পৃ. ১৪০
১০. ব্যাসদেব ঘোষ, বাংলা ছোটগল্পে বৃত্তিজীবীর সংকট (১৯৭০-২০০০), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২০১
১১. তদেব, পৃ. ১৩৪
১২. তদেব, পৃ. ১৪২
১৩. তদেব, পৃ. ১৪৩
১৪. তদেব

গ্রন্থপঞ্জি :

ক. আকর গ্রন্থ :

১. ভগীরথ মিশ্র, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

খ. সহায়ক গ্রন্থ :

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৫ম সং, ২০১৪
২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬৬
৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধানে (উত্তরার্ধ), দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৭
৪. ব্যাসদেব ঘোষ, বাংলা ছোটগল্পে বৃত্তিজীবীর সংকট (১৯৭০-২০০০), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯
৫. সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২য় সং, ২০১২
৬. সুশোভন মুখোপাধ্যায়, প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৩
৭. সোহারাব হোসেন, বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪